ceÜ

বাঙালির দর্শন ও রাষ্ট্রযাত্রা বিষয়ে

সেলিম আল দীন

একদা এই রকম ভেবে থাকবো যে, বাংলাদেশের সম্মুখ যাত্রায় তার প্রাচীন কীর্তিচ্ছায়া সঙ্গী হবে এবং ইতিহাসের যে সকল অন্ধঘূর্ণিতে এই অঞ্চল নির্বসনের শূন্যতায় হা হা স্বরে কেঁদেছে- তা সে মনে রাখবে বেদনাদীর্ণ সচেতনতায়।

প্রত্যেক জাতির যেমন একটা ভূমিরূপের স্বতন্ত্রতা থাকে তেমনি তার দর্শনের বসনের নিচে থাকে চিত্তের গড়ন। তার বলবার ঢঙটুকু- এমনকি কণ্ঠনালীর আদম আপেলের ওঠা নামাটা পর্যন্ত অন্যদের থেকে ভিন্ন থাকে। প্রত্যেক অঞ্চলের নানা কাল্ট- রিচ্যুয়ালের ভঙ্গি বহুতর বিচিত্র পথে বিভাজিত হলেও- ভূমিরূপ থেকে উদ্ভূত জীবিকা- বসন কি বসনের উপাদান ও বয়নরীতি আহার্যের উপকরণ এক বৃহত্তর এককেই ঘনিষ্ঠ করে তোলে।

এই রকম ভেবে থাকবো যে- ইতিহাসের একেবারে আলোহীন অন্ধকার কোণে থাকা মানুষেরা এই গাঙ্গেয় বদ্বীপের নদীগুলোকে চিনে নেবে পুনর্বার। তার ক্ষেত শস্য বীজ গুল্ম লাঙল একান্ত নিজের করে বুঝে নেবে সে। সঙ্গীত কাব্য চিত্রে স্বভূমির বীজ বপিত হবে- জাতি সম্প্রদায়ের জৈব সংগঠনের নৈসর্গিক উপাদানগুলো একান্ত হয়েও বিশ্বযাত্রায় হবে অংশীদার। পিরামিডের পাশেই উড়বে মসলিনের পতাকা।

কিন্তু আজ পারঘাটের দিকে তাকিয়ে দেখি- সূর্যোদয়ের আগেই সূর্যাস্তের আয়োজন ঘটেছে। রাষ্ট্র ব্যবস্থার ভ্রান্তযাত্রায় মানচিত্রের রেখাগুলো স্নায়ুছেঁড়া আর্তনাদ তন্ত্রীতে যেনব রূপান্তরিত হয়েছে। একদা যে জৈব সংগঠনের ওপর ঐশ্বরিক বিশ্বাস ন্যস্ত করেছি- তাও ক্রমেই ক্ষীণ ফাটলরেখায় ভরে উঠেছে।

এতোটা বিকলতা এতোটা বিহ্বলতা না আশাবাদী কবি না মূল্য নির্ণায়ক ইতিহাসবিদের সাজে না। কিংবা এ দুটোর কোনো একটার মাঝখানে পড়েছি ভাগ্যের ফেরে। এখন ভাবি যে- দুঃসময়ের কাঁচভাঙা দিন- তার পুরোটা সত্য নয়- আমাদেরও এতোটা হতাশ না হলেও- চলে হয়তো।

সেই প্রাচীন কৌমের দর্শন ছিল সাংখ্য। জাতি চের কিংবা বঙ। তা যে বুদ্ধের আগের তার প্রমাণ তো গোরক্ষনাথের দর্শন। যাকে বলা যায় নাথবাদ। তাতে সংখ্যার ভেতর দিয়ে দেহের রহস্য নির্ণয় পন্থার সঙ্গে বৌদ্ধ অনাত্মবাদী দর্শন মিশেছিল। সে দর্শন আত্ম আবিষ্কারের স্থানটাকে আকাশ ও মাটির সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে করা। অনড় দেহ মুদ্রা রচনা করে চোখ বুজে সেই সব চিত্র দেখ, যাতে আত্মার অভিগমন ঘটে শূন্যতায়। শূন্যতাকে ফের সেখানে দেয়া হয়েছে অদ্ভুতরূপ, যাকে ইংরেজিতে বলতে পারি ফিগারেটিভ ভয়েডনেস। এই দর্শনের ব্যাপকতা এশীয় দর্শনের ধারায় বিবেচনা করলে দেখা যায়, উত্তরকালে তা সর্বভারতীয় এবং একেশ্বরবাদের কালে পারসিক দর্শনের অন্তরস্থিত পঞ্জরটা পর্যন্ত গড়ে দিয়েছিল।

চর্যাপদ নামে আমরা যে ধর্মতান্ত্রিক পদগুলোকে জানি তার ধর্মসার খানিকটা প্রত্যাহার করলে দেখতে পাই তা চিত্র ও ভাবধ্বনির এক সমৃদ্ধ জগৎ।

একটি পদে আছে যে, সূর্য শশিকে হেরুক বীণা বানিয়ে চলছে সিদ্ধাচার্যের সাধনা।

বিশাল আকাশ চন্দ্র, সূর্য মনিবন্ধনে রেখে একটা জনপদের অন্তর্গত সাধনার এ দৃষ্টান্ত বিশ্বের আর কোনো দর্শনের আছে কি না জানা নেই।

সে বড়ো বিস্ময়। গ্রিক রোম পাহলভি সভ্যতার বিশাল ঘূর্ণাবর্তন নয়। একেবারে অন্যভাবে অন্য পথে যাত্রা। এ জাতির বাইরের জগৎটা মার খেয়েছে ভীষণ; তবু আত্ম অন্বেষণের দার্শনিক ধারাটা নিরুদ্ধ হয় নাই।

ওদিকে বৌদ্ধ ধর্ম যে এলো- ধ্রুপদী কাঠামো নিয়ে- তার অবয়ব পাল্টে দিয়ে বাংলা নিজের ভাবনায় আইকনগুলো জুড়ে দিল সঙ্গে। রাজধর্মের ভেতরে যে আনুষ্ঠানিকতা তার মধ্যে বৌদ্ধ আইকনের খানিকটা প্রভাব দেখা যে দিল, তা পরবর্তীকালের বিবর্তিত বৌদ্ধধর্ম। তাতে প্রমিতা বা পারমিতা এলেন জ্ঞানের প্রতীক হয়ে- মার এলো স্ব

> **যদি আমরা কর্মহীন ধর্মকে নিজেদের প্রধান অবলম্বন করতে অতিমাত্রায় উৎসাহী হই তবে স্বাধীন জাতির বিচিত্রতর বিকাশের পথ রুদ্ধ হবে। দেখতে পাই ভবিতব্যহীন কবন্ধ রাজনীতির শরীরে দরিদ্রতম মানুষের রক্তাক্ত অভিশাপ লেগে আছে। দরিদ্রের দর্শন নেই- ভিক্ষুকের সঙ্গীত কেবলি আর্তনাদ।**

অবয়বে ধ্বংস ও বিভ্রান্তির প্রতীকরূপে।

কিন্তু লোকায়ত ধর্মে সেই প্রমিতা- বেশ বোঝা যায় এসেছেন নৈরামনী হয়ে। নৈরামনীর সঙ্গত অর্থ হতে পারে- ন+মণি কিংবা নিরাকার নিরাকৃত রমণী। তাঁর অধিষ্ঠান সিদ্ধাচার্যের ভ্রূবিন্দুতে। সেই অবয়বহীন রমণীই হয়তো ডোম্বীর মানবী রূপান্তর।

বাঙালির ধর্মদর্শন বিস্তারিত হয়েছিল গোরক্ষনাথের মীথ ধরে, মৎস্যেন্দ্রনাথের ধর্ম প্রচারের মধ্য দিয়ে।

ইতিহাসের লুপ্ত কৌটা থেকে কিছু প্রামাণ্য যদি পাওয়া যেত এ রকম যে, বৌদ্ধধর্মের ধ্রুপদী রূপের একটা ভীষণ বাড়াবাড়ির কাল এসেছিল সে সময়ে। তবে প্রমাণ করা যেত ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি সেই নিপীড়নের পথেই স্বাভাবিকভাবে এসেছিল। যেভাবে গ্রিক সমাজের সৃষ্টিহীনতার কালে, রোমানদের টোগো ঝলসে উঠেছিল আথেন্সের পথে পথে।

বাঙালি কি হেরে গিয়েছিল। সাংখ্য দর্শন তো আর্যদর্শনের ভেতর ঠাঁই করে নিয়েছিল। বাঙালির শিব সংস্কৃতি- প্রভাবিত করেছিল

মোহেনেজাদারো হরপ্পার অনার্য ধর্মকে। গোরক্ষনাথের কায়া সাধনার অবয়বে তৈরি হয়েছিল ইরানের সুফি সাধনা।

বাঙালির রাজ প্রতাপ- পাল বংশের কালে মগধাদি ত্রিহুত অঞ্চলের সীমাতেই আবদ্ধ। তা কর্ণাটক কি উত্তর ভারত অবধি কখনোই প্রসারিত হয়নি। আর যে বিশাল গৌড় বা বাংলা সাম্রাজ্য তার সীমারেখার মধ্যে এবং সীমারেখার ওদিকে বাংলার দর্শন ছড়িয়ে পড়েছিল- জালন্ধর অঞ্চল পর্যন্ত।

সঙ্গে ছিল পণ্যসংস্কৃতি। পণ্যসংস্কৃতি কথাটার অর্থ এভাবে নির্ণীত হতে পারে যে- সমাজমানসের সূক্ষ্ম শিল্পবোধ প্রয়োজনের সীমা ছাড়িয়ে পণ্য উৎপাদনকে শিল্প সীমায় বিস্তারিত করা বলা যায়- তাঁত বস্ত্রের পাশে মসৃণ মসলিনের উৎপাদন সে পথেই এসেছিল।

২.

ইতিহাসের ক্রমধারা অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, কোনো একটি শক্তি ধর্ম বা দর্শন কালের পথে চিরস্থায়ী হয়ে দাঁড়ায় না। মানুষের স্বভাব ধর্মের মধ্যেই আছে- অদ্ভুত বৈপরীত্য। সে প্রথমে কোনো নতুন কিছু সহজে গ্রহণ করে না আবার নতুন ক্রমে যখন শতবর্ষী হয়ে ওঠে তখন সে তাকে ঠিক অস্বীকার করে বসে। এভাবে নতুনে প্রচলে পুরাতনের আর নতুনের দ্বান্দ্বিকতা।

বৌদ্ধরাজধর্মের ভেতরে ঢুকে পড়েছিল মহাভারতের বিশাল তরঙ্গ। পাল বংশের রানী চিত্রমতিকা স্বয়ং মহাভারত শুনতেন। নিশ্চয়ই সংস্কৃত ভাষায়।

অথচ-সংস্কৃতকে যাঁরা স্বর্গীয় ভাষা মনে করতেন তাদের কাছে বাঙলা ছিল ইতর মানুষের ভাষা। ইতর মানে কোনো কিছুর তুলনায়- যা অবজ্ঞেয় হেয়।

কিন্তু বিধির বিধান যাকে বলি- যে ভারি নির্মম। বাঙালি সংস্কৃত ভাষাকে কখনোই দেব ভাষা বলে মনে করেনি। বরং ঐ দেব ভাষার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে দেশকাল ও ভাষার যুক্তিতে পরাকৃত বা প্রাকৃত অর্থাৎ বাঙলা ভাষায় হিন্দুপুরাণের কাহিনী স্থানান্তর শুরু করলো। প্রমাণ মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণ বিজয়। সে কাব্য যেদিন রচিত হলো সেদিন বাঙলা শিল্পের জাতিগত গতিধারাও নির্ণীত হয়ে গেল। বাঙালির সভ্যতা মেসোপটেমিয়া ইজিপ্ট গ্রিস রোমের সংহার ক্ষুব্ধ সভ্যতা নয়- তার ধর্ম আত্মরক্ষার আত্মনির্মাণের। বিশ্বের দান সে নৈসর্গিকভাবে গ্রহণ করেছে- সাংস্কৃতিক বিনিময়ের মাধ্যমে গড়ে তুলেছে তার মানসভূমি। এর প্রমাণ তো কবিগুরু আলাউলের সিকান্দারনামা অর্থাৎ কিনা গ্রিক সম্রাট আলেকজান্ডারের কীর্তিগাথা কাব্য। তা ইতিহাস নয় ইরানীয় অভিজ্ঞতার সঙ্গে বাঙালির যুদ্ধ কল্পনার সংশ্লেষ।

বাঙালির দর্শনের মূল কথাটা হলো বস্তুজগতের সীমাকে নিজের ভাবনার পক্ষে যুক্তির অনুষঙ্গে তৈরি করা। যেমন মৎস্যেন্দ্রনাথের সাধনা- পরিচিত দেহভঙ্গিমাকে ভেঙে অন্য একটি আইকনে রূপান্তরণ। কাহ্নাচার্যের ভঙ্গি ও দর্শনভাবনা তাঁরই দর্শনের অনুগামী। নৃত্য সঙ্গীত বচনে সেই অবস্তুজগৎকে তাঁরা তুলে আনেন যা বস্তুজগতের সংঘাতকে এড়িয়ে নিজের মধ্যে একটা আত্মঋদ্ধ সাধনাস্থল নির্মাণ করে। তাতে বহির্জগৎ দ্রুত অন্তর্মুখী হয় এবং লীন হয় নানা প্রতীকে। জীবনকে তা মৃত্যুর চৌকাঠের দিকে আহবান করে কোমল পদসঙ্গীতে।

সেন বংশের আমলে বাঙালির নিজস্ব দর্শনের মধ্যে বৈদিক ছায়াপাত ঘটছে এ যেমন সত্য তেমনি এত সত্য যে গৌড়বঙ্গের নিজস্ব দর্শনও তাতে মিশ্রিত হয়েছিল। তবে উচ্চকোটি সমাজের বেদান্ত দর্শন নিম্নবর্গীয় সমাজও সেই সমাজে প্রচলিত লোকায়ত রীতির কাছে পরাজিত হয়েছিল।

নিম্নবর্গের মানুষেরই থাকে প্রকৃত মাটির গন্ধ। কাজেই ইতিহাস যে চড়াতেই গিয়ে ঠেকুক না কেন- বাঙালির স্বভাবধর্মের রক্ষায় বর্মরূপে দাঁড়িয়েছে তারাই যুগ যুগ ধরে। মানুষের সামগ্রিক রূপটাকে তুচ্ছ করে ধর্ম যখনই নিজে স্ফীতকায় হয়ে প্রাচীন বাঙলাকে একেবারে বিলুপ্তকরণের আয়োজন করেছিল তার বিরুদ্ধে নিসর্গবাদী নিম্নবর্ণের মানুষেরাই দাঁড়িয়ে গিয়েছিল তাদের স্বভাবধর্মের বশে। সে জন্য দেখতে পাই- বেদ উপনিষদের ব্রাহ্মণ্য ব্যাখ্যা শেষাবধি লোকায়ত চণ্ডীর কাছে মাথানত করেছে- মনসার তীব্র ক্রোধান্বিত দৃষ্টিকে আত্মসাৎপূর্বক নিজেকে বাঁচাতে চেয়েছে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ্য সমাজ।

জয়দেবের গীতগোবিন্দ দ্বাদশ ত্রয়োদশশতকে বাঙালির সংস্কৃত ভাষা রুচিকে প্রকাশ করে। যে কাব্যের ভাষা থেকে বুঝতে পারি- ধ্রুপদী সংস্কৃত ভাষাকে বাঙালিরা গলিয়ে নিয়েছে নিজস্ব মঙ্গলকাব্য আর পদাবলীর ঢঙে। এও বাঙালির স্বীকরণের ক্ষমতার এক কালোপযোগী দৃষ্টান্ত।

কিন্তু বাঙালির আত্মপ্রকাশের আরেকটি ধারা যেন গোপনেই দীর্ঘসূত্র শেকড়ের আকারে ছড়িয়ে পড়েছিল- সে ইসলামী দর্শন।

কিন্তু সে দর্শনের ধ্রুপদী ধারাকে অস্বীকার করেছিল বাঙলার মানুষ। সে অস্বীকারের ধারাটা বাহিত হয়েছিল শেখ জালালউদ্দিন তাব্রিজির মতো মহান ধর্ম সাধকের দ্বারা। সুফি ধর্ম সাধনার অবারিত ধারায় ইসলাম ধর্ম বাঙালির চিরায়ত নদীগুলোর মতোই স্রোতগ জীবনসঞ্চারী।

ইসলামে জাতভেদ নেই- অসীম আকাশস্পর্শী অন্বেষণ আছে। আছে মুক্তির আহবান।

আর্য দর্শনের সঙ্গে ইসলামী দর্শনের বিপুল পার্থক্য প্রথমে খালি চোখে প্রায় বোঝাই যায় না। ঈশোপনিষদ নিরাকার ঈশ্বরের উপলব্ধিজাত গ্রন্থ। তাতে আছে জগৎ পরিবেষ্টিত বস্তু নিচয়ের মধ্যে তার চলাচলের ঘোষণা আর ইসলামী দর্শনে আছে দৃশ্য ও অদৃশ্যলোকের স্রষ্টা মহামহিম ঈশ্বর ভাবনা। একটিতে জড় ও প্রাণী জগতে ঈশ্বরের দৃশ্যমান অংশ বিরাজমান আর এর বাইরে তার আত্মস্বরূপের অদৃশ্য অবস্থান- অন্যটিতে আছে মহামহিম প্রভু কুন ফায়াকুন- এই শব্দবন্ধে নিজ শক্তি ও ইচ্ছাতে এ জগৎ সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি আকারের অতীত- অংশীদারহীন। ঈশোপনিষদে দেবদেবী সম্পর্কে বলা হয়েছে দেব-দেবীর কোনো ক্ষমতা নেই- তারা নিরাকার ব্রহ্মার শক্তিতেই মাত্র শক্তিমান।

আর্য দর্শনে দেবদেবীর অস্তিত্ব স্বীকৃত কিন্তু ইসলাম ধর্মে এর কোনো স্থান নেই। এই যে বৃক্ষটি ওই যে আকাশে পউষের সন্ধ্যায় গাঢ় গোলাপী নীল দিগন্ত এই বস্তু ও দৃশ্য তাঁরই আজ্ঞাধীন।

বাঙালি নবাগত ইসলামকে বুঝতে চেয়েছিল নিরঞ্জন আর নৈরাকার শব্দ দুটি দিয়ে। বর্ণ হিন্দুদের শোষণ আর অত্যাচারে বৌদ্ধ কৃষ্টিজাত এই শব্দববন্ধ ইসলামের আকারের ও অংশীদারীত্বের অতীত ধারণার সঙ্গে খানিকটা খাপ খেয়েছিল। রামাই পন্ডিতের শূন্যপূরাণের হয়তো বা প্রক্ষিপ্ত অংশে প্রাপ্ত একটি পদ আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে- শক্তিরূপে ইসলামের আবির্ভাবের পর নাথপন্থীবাদগণ এই ধর্মের দর্শনে স্বস্তি ও মুক্তি খুঁজে ছিলেন।

সুফি সাধকদের বাস্তব ধর্মজ্ঞানের প্রশংসা করতে হয় এজন্য যে- তাঁরা বাঙালির নিজস্ব সংস্কৃতির ওপর অনাকাঙ্ক্ষিত চাপ সৃষ্টি করেননি।

ইতিহাস তো বলেই যে মহাসাধক শেখ জালাল উদ্দিন তাব্রিজি- লক্ষণ সেনের সভায় এক সঙ্গীত প্রতিযোগিতার প্রধান বিচারক ছিলেন- তাতে নৃত্যও ছিল। নৃত্য ও সঙ্গীতে যাঁরা অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন পদ্মাবতী-বিদ্যুৎপ্রভা, জয়দেব মিশ্র প্রমুখ।

সুফি ধর্মের উদারতার ভেতর দিয়েই নিপীড়িত বাঙালির একটা বিশাল অংশ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল। তবে রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতা ছিল না পীর দরবেশদের। ধর্ম নির্বিশেষে মানুষকে তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন নিজ নিজ সাধনস্থলের পাশে।

বাঙালির সর্বপ্রাণবাদের সঙ্গে সমন্বয় সাধনপূর্বক ইসলাম ধর্মপ্রচারকগণ গড়েছিলেন দেশ কালানুগ এক অনন্য ধর্মদর্শন। মানুষ বৃক্ষ এবং প্রাণী জগৎ- কবুতর কাছিম গজার মাছ তাঁদের ধর্ম প্রচারে শতযোজন পথের সঙ্গী হয়েছিল।

ইসলামের এই উদারতা বাঙালির দর্শনকে নতুনভাবে পুষ্ট করলো। ভক্তিবাদের ভারতীয় দর্শনের সঙ্গে একশক্তির কেন্দ্রবিন্দুকে চৈতন্যদেব আবিষ্কার করলেন। তার মর্মস্থলে ইসলামী প্রেরণা বহিরঙ্গে অনার্য ও অব্রাহ্মণ্য উপাদান।

তবে এ কথা মনে রাখতে হবে যে, ধর্মের সাধারণ প্রবাহের ভেতরে বাঙালির সহস্রবৎসরের বাহিত দর্শনের কিছু না কিছু প্রভাব তখনো ছিল- এখনো আছে। আর দুকালে যা বাহিত হয়- ত্রিকালে তার অস্তিত্বের সমূহ সম্ভাবনা নাকচ করা যায় না।

৪.

হোসেনশাহী যুগে- বাঙালির রাজ্য এ প্রাণধর্মের একত্র যাত্রা ঘটেছিল। ইতিহাস ও জীবনীকারগণ যাই বলুন না কেন- চৈতন্যদেব বাসভূমি থেকে উৎকলে যে গেলেন- তা পাল ও সেন বংশের আমলে গৌড় রাজ্যের অন্তর্গত ছিল- এবং বাঙলার ভাষা প্রভাব ব্যতিরেকেও সে অঞ্চলে নাথ দর্শনের অল্পবিস্তর প্রাধান্য ছিল। উপরন্তু চৈতন্যদর্শন জগন্নাথ কাল্টের আশ্রয় লাভ করে উৎকলে। প্রচলিত রিচ্যুয়ালের মধ্যে চৈতন্যদর্শনের এই আশ্রয় বাঙালির দর্শনের আঞ্চলিকতাকেও প্রাচীন যুগের ধারায় অতিক্রম করার নিদর্শনরূপে গণ্য হতে পারে।

ভাষা ও বৃহত্তর সংস্কৃতির ঐক্য ধর্মনির্ভর সমাজে সংঘাতের সম্ভাবনাও তৈরি করে। তবে ইতিহাস বলে যে, সামাজিক স্তরেই ত্রিবিধ চতুর্বিধ সম্প্রদায় থাকা সত্ত্বেও- ধর্মান্ধতা ক্বচিৎ বাঙালির সামাজিক শক্তিকে বিঘ্নিত করেছিল।

বৈষ্ণবীয় দর্শনের সঙ্গে শাক্ত- এবং উভয়বিধ ধর্ম দর্শনের সঙ্গে সুফি মতাবলম্বীদের বিরোধের ক্ষেত্র সামাজিক দুর্গ্রহ হয়ে দেখা দেয় নাই। এবং এই সর্বধর্ম সমন্বয়ের মাধ্যমে গড়ে উঠেছিল বাঙালি সমাজ।

এখানে মনে রাখা দরকার যে বাঙালির সংস্কৃতির সুবৃহৎ ঐক্যের মধ্যে শ্রেণী বর্গ- দর্শন ধর্মের নানা ভিন্নতা সেকালেও ছিল একালেও আছে। পার্থক্য শুধু একটাই সেকালে তা এই সামাজিক সংহতিকে এতোটা বিপর্যস্ত করেনি যাতে মানুষ সম্প্রদায়গতভাবে খুনের নেশায় উন্মত্ত হয়ে ওঠে। রাজ্য ক্ষমতা সামাজিক সংস্কৃতিকে বিপন্নও করেনি ততোটা। কেবল একটা কালের কথা বলে অর্ধস্ফূট বাঙালির ইতিহাস- সেই কাল সেন বংশ কি শশাঙ্কের কাল।

তখন শাস্ত্রধর্মের উপর ভর করেছিল ব্রাহ্মণ্যবাদ এবং তা রাজশক্তির ভেতর দিয়ে কিঞ্চিতধিক প্রকাশিত হয়েছিল।

বাঙালির রাজ্যধর্মের ভেতর আধুনিক কালের রাষ্ট্রধর্মের খোঁজ দরকার। তা এই জন্য যে- রাজা সর্বস্ব শাসনের ছায়ায় বাঙলায় গড়ে উঠেছিল- সহস্র বছরের সামাজিক কাঠামো। রাজার প্রতি কর্তব্য- রাজসহায়তা- বিচার- বাণিজ্য এবং একেবারে ভূমি সংলগ্ন সামাজিক কাঠামো সবই একালের অর্থেও প্রায় গণতান্ত্রিকভাবে রচিত হয়েছিল। কুলিক বণিক শ্রেষ্ঠী- তন্তুবায়ী- ক্লার্জিম্যান প্রভৃতি উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও ধর্মীয় সমাজ থেকে গৃহীত ব্যক্তিবর্গ সমন্বয়ে গড়ে উঠেছিল সে সমাজ।

রাজার নজরদারি- সাংস্কৃতিক আবহও ব্যক্তিগত অধিকারকে খর্ব করতো না- একটা সময় পর্যন্ত। ব্যক্তিগত অধিকারটা প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলায় সামাজিক কাঠামোর ভেতরই স্ফূরিত হতো।

মুকুন্দরামের চন্ডীমঙ্গলে- নগর পরিকল্পনার যে নকশা পাই- সে কবি কল্পনা নয়- নিতান্তরূপে বাঙালি রাজ্য ব্যবস্থার অধীনে সামাজিক কাঠামোরই নাগরিক রূপক সন্দেহ নেই।

৫.

বাংলায় মুসলমানদের শাসনামলে নতুনতর শাসনতান্ত্রিক অবকাঠামোর কারণে কিছু ফার্সি ও আরবি নামের পদ সংযুক্ত হয়- কিন্তু বোধকরি তা মহামতি আকবরের কালে। গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ- আলাউদ্দিন হুসেন শাহ- নুসরত শাহ- রুকনুদ্দিন বরবক শাহ প্রমুখ সুলতানদের কালে- বাঙালির শাসনতান্ত্রিক কাঠামো- সহস্র বৎসরের বাঙালির সামাজিক কাঠামো- যুগধর্মের কারণেই পরিবর্তিত হয়েছিল। যেমন-চট্টগ্রাম শ্রীহট্ট- মৈয়মনসিংহ অংশ চিরস্থায়ীরূপে বঙ্গীয় রাজ্যের অন্তর্গত হওয়াতে- পুন্ড্রবর্ধনের সমাজ ও সংস্কৃতি কাঠামোটা একক অঞ্চলের রূপে আবদ্ধ থাকলো না। উপরন্তু বিজিত অঞ্চলসমূহ সহজে বঙ্গীয় সংস্কৃতির নাগরিক অংশটুকু গ্রহণ করেছিল- এমন মনে করার কারণ নেই। অন্তর্ভুক্তির পর অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সমঝোতার মাধ্যমে- কেন্দ্রের সঙ্গে রাজধানীর সাংস্কৃতিক সংযোগ সম্ভব। এ ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছিল।

বাঙলা ভাষায় যখন সর্বভারতীয় ও ইরানি শিল্পরীতি এমনকি নতুন নতুন কাহিনীর আগমন ঘটেছিল তখন ইউরোপের ইংল্যান্ড অংশে সংঘটিত হলো ভাবনা বিপ্লব। ঐ কালের শিল্প কাঠামোর ভেতরে গৃহীত হয়েছিল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বহুতর কাহিনী। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো- সে সকল শিল্পরীতির উদ্ভাবনা স্বদেশের নয়- অংশত গ্রিসের এবং পূর্ণরূপে রোমের।

এখানেও সেই ব্যাপারটাই ঘটছিল। পাহলভি সভ্যতা ইউরোপকে স্পর্শ করেছিল এবং কিছু শতাব্দী পর আলেকজান্ডার অকারণে পার্সিপোলিসের ধ্বংসসাধনপূর্বক ভারতের একাংশে এসে বিশ্ববিধানের বিধিটাই হয়তোবা পূরণ করলেন। প্রাচ্য নিজের প্রাচীন তোরণের সামনে দেখতে পেল-ট্রয়জয়ী যবনদের।

সেই আথেন্সের সংস্কৃতি পারসিক সভ্যতায় কতদূর বাহিত হয়েছিল তার সাক্ষ্য আছে শাহনামায় সিকান্দারনামায়।

পাহলভি-পারসিক সভ্যতার ধারায় রচিত মুসলমানদের শিল্পকর্মগুলো পঞ্চদশ শতক থেকে আসন্ন বাঙালির ধর্মদর্শনের পাশাপাশি এসে জড়ো হচ্ছিল। বাণিজ্যসূত্রে যে সকল ইউরোপীয় চট্টগ্রাম বন্দরে এসেছিল তার যথাযথ উল্লেখ রয়েছে আলাউলে। কিন্তু সেটা ট্রেড সেক্টর- শিল্পরীতির সঙ্গে তার সম্পর্ক বোঝাতে এখানে এর উল্লেখ নয়।

কিন্তু এ সময়ের বিস্ময়ের ব্যাপার হলো- সিকান্দারনামার রূপান্তরণের সূত্রে প্রাচীন গ্রিসের সঙ্গে বাঙালি চিত্তের পরিচয় সংঘটন। সে পরিচয় প্রত্যক্ষ নয়- তার সঙ্গে কল্পপুরাণের বিস্তারিত সংযোগ সহসা একথা ভাবায় না যে ঐ সুবিশাল কাব্যে কিভাবে ইউরোপ বা গ্রিস এলো।

তবে- ইতিহাসের বিকল্পরূপকে যারা কার্যকারণ সংশ্লিষ্টরূপে প্রতিষ্ঠা করতে আগ্রহী- তারা নিশ্চয়ই কবুল করবেন যে- এই পথেই বাঙালির মনের বিশ্বযাত্রার সূত্রপাত।

অপঘাত ইতিহাসই জয়ী হয়েছে- ইংরেজ শাসনকালে যদি তা না হতো, আমরা কল্পনা করে নিতে পারতাম যে- বাঙালি নিজের তাগিদে খুঁজে নিতো ইউরোপকে। কারণ সমগ্র ভারতে অন্বেষণ ও অভিগমনের এতো বিশাল পরিধি বাঙালি ব্যতীত আর কোনো জাতি বা সম্প্রদায় রচনা করতে পারেনি। আমরা তো হিউয়েন সাঙ ফা হিয়েন ইবনে বতুতার পাশে শীলভদ্র অতীশ দীপঙ্করকে দাঁড় করাতে পারি। তবে ওঁরা এসেছিলেন দেখতে আর দুইবাঙালি গিয়েছিলেন শেখাতে।

ইতিহাস এ কথা যেন আর না বলে যে পরাধীন জাতি মানে পরাজিত জাতি। এ এক সাধারণ ইতিহাসজ্ঞানপ্রসূত উক্তি যে- বিজিত জাতি অবজ্ঞেয়। বিশ্বজুড়ে ইউরোপীয় দেশগুলোর উপনিবেশসমূহের দিকে তাকালেই দেখতে পাই- লুণ্ঠনবৃত্তির বিরুদ্ধে শত তুতাআমারু আর তিতুমীরের বিদ্রোহ। পরাজিত মানুষ মানেই বিদ্রোহী মানুষ।

৬.

এ কথা স্বীকার্য যে, হোসেনশাহী গৌড় বঙ্গের বিশাল পরিধি ভেঙে গিয়েছিল ইতিহাস প্রোক্ত বারো ভূঁইয়াদের কালে। তখন মুঘল যুগ। হুসেনশাহী আমলে বাঙলার রাষ্ট্র সম্ভাবনা যতোদূর এগিয়ে ছিল মুঘলকালে তা একেবারে ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। বরং স্বাধীন সাম্রাজ্যের নাগরিক হওয়ার পরিবর্তে বাঙালিরা পরিণত হয়েছিল বৃহত্তম মুঘল সাম্রাজ্যের প্রাদেশিক প্রজারূপে। মুঘলদের পক্ষে সর্বভারতীয় সংস্কৃতির রূপ ও প্রকৃতি অনুধাবন কালক্রমে হয়তো সম্ভব হয়েছিল কিন্তু পূর্বাঞ্চলীয় জনপদের সংস্কৃতি- সমাজ ব্যবস্থা প্রভৃতি সম্পর্কে তাঁদের আগ্রহের কোনো বিশেষ সংবাদ পাওয়া যায় না।

শাসনতন্ত্র না থাকলেও মুঘলদের শাসনের একটা সুবিশাল উদারতার পরিধি পাওয়া যায় পরোক্ষভাবে। এক. কোনো প্রদেশের

ভাষা ও সংস্কৃতির ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা। দুই. প্রশাসনিকভাবে অঞ্চল বিভাজন ও স্থানীয় পর্যায়ে কার্যকর প্রশাসন স্থাপন এবং তিন. উৎপাদন চাষাবাস সম্পর্কে সর্বাধুনিক নিয়মকানুনের প্রবর্তন।

কিন্তু মুঘল শাসন বাঙালি মানসে দুইশত বছরেও তেমন ছাপ ফেলতে সক্ষম যে হয়নি তার প্রমাণ সে সময়ের বাঙালির দর্শন চিন্তা এবং শিল্পকর্ম। এই দুইশত বছরে দেখা যায়- চৈতন্যদেব প্রবর্তিত দ্বৈতাদ্বৈতবাদী দর্শনের জের ও বিকৃতি ঘটেছে এবং সুফিতন্ত্র প্রায় পরিপূর্ণভাবে গোরক্ষদর্শন বা নাথবাদের মধ্যে নতুনতর ভুবন আবিষ্কারের চেষ্টায় রত। কেবল স্থাপত্যশিল্পে বিশেষত মুসলিম প্রার্থনালয়সমূহ নতুন ধরনের লোকায়ত আঙ্গিকে মুঘল স্থাপত্যকলার অপ্রমেয় প্রাণশক্তিকে ধারণের চেষ্টা করেছে।

চারুকলার ক্ষেত্রে- বাঙালির প্রাচীন ধারা অব্যাহত রইল। রঙ ও রেখা লোকায়ত এবং তা নিরেই বাস্তবতাকে পরিহারপুর্বক এক নান্দনিক ভুবন তৈরির কাজ অব্যাহত রাখলো।

পাল যুগের চিত্রকলাই উচ্চাঙ্গ চিত্রকলা এবং তা বাঙালির ধ্রুপদী চিত্ররীতির আদি নিদর্শনও বটে। ফিগারেটিভ চিত্রকলায় সে সময় রঙ ও রেখার বিন্যাস এতোটা অলঙ্কৃত ও তীক্ষ্ণ যে- দেখে বিস্মিত হতে হয়। আবার ঐ একই চিত্রকলার মধ্যে সর্বভারতীয় চিত্রকলায় চারিত্র্যলক্ষণও বিদ্যমান। নবজাতক বুদ্ধ কিংবা অন্যান্য বৌদ্ধ প্রসঙ্গ- একই চিত্রে স্থান করে নিয়ে একটা পূর্ণাঙ্গ গল্প তৈরিতেই ব্যস্ত। গুপ্তকালে এবং ময়নামতির পোড়ামাটির ফলকে পুরাণ ও লোকায়ত জীবন ঐ একই ধারায় অর্থাৎ তাতে পুরাণ বা লোকজীবনের গল্পগাথা বিবৃত। তা থেকে বেরিয়ে যা এসেছে তা উৎসব- নৃত্য ও সামাজিক প্রসঙ্গ।

তবে মুঘল যুগে মুঘল শাসনের বহির্দেশে বাঙলা সাহিত্যের এক বিস্ময়কর উত্থান দেখতে পাই আরাকানের রাজসভায়। সমগ্র ও সহস্র বৎসরের বাঙলা সাহিত্যের মূল সুরে যুক্ত হলো নতুনতর তান। সে তানে লোকায়ত জীবন ছাপিয়ে আরাকানি ঝরনা রইল সুহিদেশাখ- পটমঞ্জরি আর ময়ূর রাগে। অনুমান করা যায়- আরকানের রাজসভাতেই ইরানি চিত্রকলা ধারা বাহিত হয়েছিল ফারসি কাব্য হপ্তপয়করের সুবাদে। ঐ গ্রন্থে ইরানি চিত্রকলায় এক সূক্ষ্ম অভিব্যক্তি রয়েছে।

বাঙলা লিখন পদ্ধতি চিরকালই চিত্রল ও নান্দনিক। চর্যাপদ থেকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এবং আলাউল পর্যন্ত এই লিখন পদ্ধতি ইরানি বা সেমীয় ক্যালিগ্রাফি থেকে কোনো অংশে কম সৌকর্যমন্ডিত নয়। ষোড়শ শতকেই বাঙালির লিখন পদ্ধতি চূড়ান্ত শিল্পোৎকর্ষ লাভ করেছিল।

অন্যদিকে উজ্জ্বল শিল্পচক্রাবর্তের বাইরে মানবিক মূর্ছনায় গড়ে উঠেছিল- গীতিকার ধরা। সে এক আশ্চর্য শিল্প আয়োজন। বাঙালি চিত্তের যুগান্তরের চিহ্নবাহী ঐ সকল গীতিকা প্রাচীন বাঙলার সর্বপ্রাণবাদের সঙ্গে কালিক ধর্মের সমন্বয় ঘটাতে সক্ষম হয়েছিল। নাথপন্থা- সুফিবাদ কিংবা দ্বৈতাদ্বৈতবাদী ধর্ম দর্শন- কোনোটাই সে অর্থে পূর্ববঙ্গীয় গীতিকায় গৃহীত হয়নি।

এর ভেতর থেকে তবু যে আলো ঠিকরে পড়ে- সে এক বিস্ময়কর মানবিক আলো। প্রাকৃত জীবন সেখানে আবেগে- বেদনায় হয়ে ওঠে বিশ্বমুন্সি। সেখানে আছে গ্রিক নাটকের প্রতিদ্বন্দ্বী কাহিনী- মানবিক আর্তনাদ ও আবেগের সকরুণ পরিসমাপ্তি। কবরের কান্নায় আন্ত সম্পর্কের ভাইবোন পরস্পরের প্রতি প্রেমে আকৃষ্ট হয়- না জেনেই। বেদের ঘরে লালিত আরো একটি মেয়ে বিবাহের পূর্বে জেনে যায়- অপরিচিত যুবকটিই তার সহোদর ভাই। কাহিনীর পরিণতিতে দেখতে পাই দুইজনের আত্মহত্যা।

লোকায়ত ধারাই বাঙালির প্রাণকেন্দ্রে সূর্যশশীর তন্ত্রী বীণা বাজিয়েছে- এবং আজও শত বিকারের মাঝে বাজিয়ে চলেছে। কিন্তু সে পরের কথা।

মুঘল যুগের অবসানে সুবেহ বাংলা প্রায় স্বাধীনভাবেই তার অস্তিত্ব রক্ষা করেছিল। বর্গীর মতো জাতীয় দুর্যোগে নবাব আলিবর্দি খাঁ এবং সমগ্র জাতি একত্রিত হয়েছিল। সে দুর্যোগ সেই অসীম প্রজ্ঞাবান নবাবের সময়োচিত সিদ্ধান্তের ফল। ভাস্কর পন্ডিত নিহত হয়েছিল এবং বাংলা মুক্ত হয়েছিল বর্গীর লুণ্ঠন থেকে।

ইতিহাসে দাবার ছক উল্টাতে দেরি হয় না। এবং সকল দেশের পরাধীনতার প্রারম্ভে একজন সিরাজউদ্দৌলার পাশে একজন মীরজাফর থাকে।

ক্লাইভের হাত ধরে ইংরেজ উপনিবেশের বুটজুতায় ছাপ প্রথম পড়লো বাঙলার মানচিত্রে। অতঃপর দ্রুত তাদের জুতার তলার ছাপ সমগ্র মুঘল সাম্রাজ্যের উপর ছড়িয়ে পড়লো।

মুঘল শাসন এক অদ্ভুত স্ববিরোধিতায় পরিপূর্ণ ছিল। তা অর্থনীতি, সংস্কৃতি সমাজকে স্বস্তি দিয়েছিল। সমগ্র ভারতবর্ষকে একত্রীকরণের মধ্য দিয়ে ধর্ম- আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিচিত্রতাকে একীভূত ঐক্যে দাঁড় করাবার চেষ্টা করেছিল। অথচ সে সম্রাটতন্ত্রে জনগণের অংশিদারীত্ব ছিল না। এমনকি ষোড়শ শতকে ভারতীয় সমুদ্রোপকূলে বাইবেল ছাপানোর যে গুটেনবার্গ যন্ত্রটি এসেছিল তাকে মুঘলদের রাজদরবারে স্থান দেবার কোনো আগ্রহই দেখা গেল না। এখন তো মনে হয়- মুদ্রণ যন্ত্র এলে ভারতবর্ষ কখনো পরাধীন হতো না। কারণ তত দিনে ইতালিতে কমেদিয়া দেল- আর্তে শ্রেণীর বিভিন্ন নাটকই ছাপা হয়েছিল হাজার দেড় হাজার।

তথাপি মুঘল শাসনতলে বঙ্গ ভারত উপমহাদেশের রাষ্ট্রসত্তা লাভের সম্ভাবনাই ছিল সবচেয়ে বেশি। অতীতে আরো একবার প্রাচীন সাম্রাজ্যের সীমায় ভারতবর্ষ অখন্ডরূপ লাভে সমর্থ হয়েছিল এবং তা সম্রাট অশোকের কালে।

ইংরেজদের লুণ্ঠনবৃত্তির ধারায় বাঙালির নবজাগরণের সূত্রপাত। সেই নবজাগরণের কালে ঠিক এ কালের ইঙ্গ-মার্কিন কূটবুদ্ধি সেকালেও কাজ করেছিল। ইংরেজদের প্রধান শত্রু ছিল মুঘল সম্রাট। কারণ একীভূত বঙ্গ ভারতের একান্ত আইকন ছিলেন সর্বশেষ মুঘল সম্রাট কবি বাহাদুর শাহ জাফর। উপরন্তু ভারতবর্ষের যেখানেই ইংরেজরা পা বাড়িয়েছে, সেখানেই মুসলমান নবাবদের তরফ থেকে বাধা পেয়েছে। কাজেই দরকার ছিল- সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির প্রথম ধারাটা তৈরি করা। সে কাজে সফল হলো তারা।

খরা দুর্ভিক্ষ- মহামারী- ক্ষেত লোপাট সবই শুরু হলো- ভারতবর্ষে ইংরেজ সৃষ্ট নগর ও নাগরিক জীবনের বাইরে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তীর্থকরারোপ- বাণিজ্য লুণ্ঠন, কৃষি লুণ্ঠন, বয়ন শিল্পের ধ্বংস সাধিত হলো নির্বিঘ্নে। শুরু হলো মাদ্রাসা ও ইংরেজি শিক্ষার দুই ধারা। ইংরেজ সাম্রাজ্যে শিক্ষার বিষয়টি রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যে বিবেচিত হয়েছিল সে বিষয়ে আজ আর সন্দেহ নেই।

সম্রাট আওরঙ্গজেবকে কেন্দ্র করে যে নতুনতর সাম্প্রদায়িক ইতিহাস ইংরেজদের হাতে সৃষ্ট হলো সে ধারায় তারা মুসলমানদের ধর্মানুভূতিকে সহানুভূতির ছলে ব্যবহার করলো- ধর্মশিক্ষা প্রচলনের মাধ্যমে।

৭.

শেষের দিকটা সামলাতে পারেনি ইংরেজরা। মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, নেতাজী সুভাষ বসু, বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসু, সত্যেন বসু, নজরুল ইসলাম, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, শেরে বাংলা, সব মিলিয়ে এক দুর্ধর্ষ লড়াকু কাল।

উপরন্তু সিপাহী বিদ্রোহের অভিজ্ঞতা- নিষ্ঠুর নিপীড়ন, তিতুমীরের রণসাজ- ফারায়েজি বিদ্রোহ, ফকির মজনু শার বিদ্রোহ, সূর্যসেন- প্রীতিলতাদের আত্মাহুতি- সব মিলিয়ে পুরো দুই শতাব্দীর কোনো এক যুগে শান্তিতে থাকেনি ইংরেজরা।

সে জন্যেই বুঝি ডায়ারের গণহত্যা- সূর্যসেন ক্ষুদিরামের ফাঁসি সে জন্যেই বুঝি কোলকাতা দিবসের নরমেধ এবং র‍্যাডক্লিফের হাতে ফল কাটা ছুরি- এক মুঘল সাম্রাজ্যে বহুরাষ্ট্রের সম্ভাবনা সৃষ্টি।

ক্রোধটা বাঙালিদের উপরই বেশি ছিল। বাঙলা ভাঙা- বাঙলা জোড়া দেয়া- আবার ভাঙার সম্ভাবনা রেখে দিয়ে সম্প্রদায়ভিত্তিক গোঁজামিলের রাষ্ট্রসৃজন সবই তাদের প্রাকৃতক্রোধ এবং কূটচালের ফল।

গোঁজামিলের রাষ্ট্র এই জন্য বলা যে ধর্মকে কেন্দ্র করে ইউরোপে একটি রাষ্ট্রেরও সৃজন হয় নাই। ইউরোপীয় রাষ্ট্রতন্ত্রে ক্যাথলিক

প্রোটেস্ট্যান্টদের ভিন্নতা ভাষা ও ভূগোল দিয়েছে ঘুচিয়ে। বিখন্ডিত ইতালি রাষ্ট্র পরিণতি পেলো- প্রুশিয়া বিস্তারিত হলো জার্মানিতে অথচ বঙ্গভারত বিভাজিত হলো ভাষা ভূগোল সহস্র বৎসরের আঞ্চলিক অখন্ডতাকে একেবারে অস্বীকার করে মধ্যরাত্রির কোনো এক মদ্যপের হাতের কলমে আঁকা প্রায় খেয়াল খুশির আঁচড়ে।

বাঁধভাঙা স্রোতে নামলো মুক্তিযুদ্ধ। কৃষকের ঘরে- শ্রমিকের ঘরে- মুয়াজ্জিনের সুমধুর কণ্ঠে জেগে উঠলো মুক্তির আজান। মন্দিরের গির্জায় উচ্চারিত হলো মুক্তির স্তোত্র ক্যাঙে বাজলো ঘণ্টা।

বাংলা ভাষার উপর সহস্র বৎসরের নির্যাতনটাও কি মনে করা যায় না। প্রাকৃত ভাষা- সেই তো কোনো কালে রাজদরবারের ভাষা হয়ে ওঠেনি সে- অথচ কি বিপুল প্রাণশক্তিতে আছড়ে পড়লো কীর্তনে- পদাবলীতে আলাউলের পদ্মাবতীতে। সমুদ্রঘূর্ণিতে মেতে উঠলো মধুসূদনে -বিশ্ববীণায় বেজে উঠলো তা রবীন্দ্রনাথের হাতে।

মাটি যাকে লালন করে শক্তির কি সাধ্য আছে তাকে কেড়ে নিতে পারে।

সেইতো বাঙলা ভাষা- যা কোনো কালে অভিজাতের সম্মান লাভ করেনি- বাঙালির আধুনিক উন্মেষ কালে সে পাঁজরের রক্তে ভিজে হয়ে উঠলো রাষ্ট্রভাষারূপে সহস্র বছর পর ।

যে জাতির মাতৃভাষা জেতে, সে জাতি আর কোনো কিছুতে হারে কি না। না হারে না।

বাঙালির অর্থনীতির দর্শন তার ধর্ম ও সংস্কৃতির ধারাতেই বিকশিত হয়েছিল। সেন, পাল কিংবা হোসেন শাহের স্বাধীন বাংলার বাণিজ্য সমগ্র ভারত এবং বিশ্বব্যাপ্তি লাভ করে। বারবোসা এসেছিলেন সোনারগাঁতে এক বিকালে। সেই বিকালে মেঘনার ঘাটের পণ্যবাহী জাহাজে খালাস ও বোঝাই করা মালের একটুখানি যে বর্ণনা করেছেন তিনি তা থেকে উপর্যুক্ত ধারাণায় সহজেই উপনীত হওয়া যায়।

আমাদের প্রাচীন ও মধ্যযুগের অর্থনীতি খুব সরল পথে চলেছে এমন ভাবা যুক্তিযুক্ত নয়- স্থল ছেড়ে সমুদ্রের দিকে তার যাত্রা যে ঘটেছিল- মধ্যযুদের নানা কাব্যে তার সাক্ষ্য আছে। এমনকি লোকায়ত জীবনের প্রাচীন নায়ক চাঁদবেনে বণিক চরিত্র সত্ত্বেও বিস্ময় ও শ্রদ্ধার এক উঁচুবেদীতে সমাসীন হয়ে আছেন।

কিন্তু আজকের রাষ্ট্র ব্যবস্থায়- অর্থনীতির পরিকল্পনার মধ্যে আমাদের অন্তরের ছাপ নেই। উপর থেকে তা সমাজজীবনের উপর পরিকল্পনার নামে ছড়িয়ে দেয়া হয়- যেনবা রাজার যুদ্ধ যাত্রার আগে ও জয়ের শেষে হাতির পিঠ থেকে সোনা-রুপার চাকতি ছুঁড়ে দেয়া। তাতে হুড়াহুড়ির মধ্যে কিছু একটা কেউ পেলেই ভাগ্য। এ যে রাজার মুদ্রা। আমাদের অর্থনীতিবিদরা বুঝতেই চান না- সমুদ্র বালিধানের ফলনটা পুনর্বার ফিরে আসে স্বর্গগন্ধী অন্নরূপে যদি থাকে ফসল বোনার সময়ে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা ও গাজিপীরের গান কি কবির লড়াই।

অর্থনীতিকে রাষ্ট্রব্যবস্থায় একটা প্রেসক্রিপশন বানিয়ে পঞ্চবর্ষীয় ব্যবস্থার নামে আমাদের অর্থনীতির দন্ডধারীরা চালিয়ে দিচ্ছিলেন বটে- কিন্তু তা যথার্থরূপে সমাজের হয়ে উঠে নাই। সমাজকে বুঝে অর্থনীতির পরিকল্পনা করার প্রশ্নই ওঠে না এখানকার বাংলাদেশে। উন্নয়নের তাগিদটা বহিরঙ্গের এ কথা সত্য- কিন্তু তার সঙ্গে সাধারণের অন্তরের যোগ না ঘটলে সে উন্নয়ন কেবল যে উপরিকাঠামোর উন্নয়ন। আমাদের অর্থনীতিতে সংস্কৃতির জ্ঞানটা একেবারেই বর্জ্য। আর সংস্কৃতির ধারার সঙ্গে সঙ্গতিহীন কোনো ধরনের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। তা সে প্রাচীন গ্রিস হোক কি একালের বাংলাদেশ।

রাষ্ট্র ধারণাটাই যখন সিংহভাগ মানুষের কাছে অস্পষ্ট- তখন রাষ্ট্রের পক্ষে তার সম্মুখযাত্রার চাকা চালিয়ে নেয়া তো সম্ভব নয়। কারণ রাষ্ট্রধারণা বাঙালির রাজ্যধারণার স্বাভাবিক বিবর্তন থেকে আসেনি- তা হঠাৎ করে সাগরপাড়ের লোকদের দেয়া ছকে গড়া। তার অর্জনও মানবিক পন্থায় আসেনি- এসেছে সাম্প্রদায়িক হত্যাকান্ডের মতো নৃশংস ঘটনার মধ্য দিয়ে।

বাঙালির নিজস্ব রাষ্ট্রদর্শন নেই। সে জন্য রাষ্ট্রের প্রতি তার দায়ও সে ততোটা বোধ করে না। মুক্তিযুদ্ধের পর অর্জিত একটি স্বাধীন ভূখন্ডকে আমরা প্রকৃত রাষ্ট্রের বিকশিত রূপের কাছে পৌঁছে দিতে ব্যর্থ হয়েছি।

কিন্তু সে ব্যর্থতা জনগণের নয় আমাদের- অর্থাৎ আমরা যারা রাষ্ট্রক্ষমতার সকল সুফল নিংড়ে নিচ্ছি- তাদের।

বাঙালির নিজস্ব দর্শনের জায়গাটাতে তাই রাষ্ট্রকে দাঁড় করাতে হবে পুনর্বার। কিন্তু প্রশ্ন থাকে যে রাষ্ট্র ক্ষমতা লাভের অশৌচ কোলাহলে- এ বিষয়টি তবে কি অমীমাংসিতই থেকে যাবে।

ধাঁধাটা লেগেই আছে দুচোখে। স্বাধীন দেশে প্রাচীন পুনর্ব্যক্ত হবে- মহাগ্রন্থের পঙক্তিগুলো ভাসবে আকাশে। সেই পুন্ড্রবর্ধনের সমাজ কাঠামোর গণতান্ত্রিক সম্ভাবনা ধর্মরাজিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পদ্ধতি নতুন কালের আবহে উঠবে জেগে। বাঙালির জেনেটিক্যাল প্রবাহগুলো যমুনার কল্লোলে জাগবে।

বসন্তে শরতে ঘনবর্ষায় গীত হবেন রবীন্দ্রনাথ- তরুণ প্রেমের অবোধ অনুভূতি নজরুলের পঙক্তিমালা ভ্রমর ডানায় কাঁপবে। জীবনানন্দ দাশের প্রকৃতি বর্ণনায় পঙক্তিগুলো ফিরে ফিরে আসবে অন্য সুরে, অন্যরূপে তরুণ কবির কলমে। কৃষকের হাতে কোকা-কোলার বোতল নয়- থাকবে বিরল প্রজাতির সুগন্ধী ধানের বীজগীতি।

কিন্তু তাতো হয়ইনি বরং স্বাধীনতা লাভের অনতিপর্বে হত্যা রক্তস্রোতে নৈরাজ্যে প্রায় নৈরাষ্ট্র করে তুলেছে দেশটাকে।

বাঙালির জীবন দর্শন সহস্র বৎসরের ইতিহাস অকরুণ হিংস্র নিসর্গের বিরুদ্ধে লড়াই করার দর্শন। তা জীবনের পথ বেয়ে কাব্যে ঘুরে ফিরে আসে পুনর্বার কাব্যের কাছেই। সে দর্শনে অতিলৌকিকতার ছদ্মাবরণ বাঙালিকে কখনো জীবন বিমুখ করেনি। বাঙালির দর্শন পলায়ন বা নির্জীবের দর্শন নয়- সে দর্শন প্রকৃতি ও ঈশ্বরের যুগল সম্মিলনে কর্মের পথে মানুষকে আহ্বান করেছে। ব্যক্তিস্বরূপকে সমষ্টির মধ্যে প্রত্যক্ষ করে সে লীন হতে চেয়েছে একটি চিরায়ত মানব ধর্মের রেখায়। সে বিষয়টা বাউলদর্শনের মধ্যে দেখতে পাই। প্রচলিত ধর্ম দর্শনের সকল মর্মসার গ্রহণপূর্বক তা দাঁড়িয়েছে এক নতুন ভূমিতে। সে স্বর্গনরকের ধারণাকে স্বীকার করে না আবার অস্বীকারও করে না। তবে জীবনের গভীর অঞ্চল থেকে তুলে আনে তার মানব মুক্তির বাণী- অনড় ধর্মসমাজকে অস্বীকারপূর্বক এক দিব্য মানবের উত্থান কামনা করে বাউলবাদ। এর অন্তরে আছে সাংখ্যযোগ দর্শন- নাথবাদী দেহতত্ত্ব সঙ্গে আছে ভক্তিবাদ ও ইসলামের লোকায়ত রূপ। বিশ্বদর্শনে বাউলবাদ এক অভিনব সংযোজন। সাংখ্য কি চর্যাপদের দর্শন উত্তরকালে ভক্তিবাদী দর্শন- ইসলামের সুমহান আহ্বান কোনো কিছুকেই বাঙালি বর্জন করেনি- বরং তাকে আত্মস্থ করে নিজের অস্তিত্বের সৌকর্যকে সৌষ্ঠবিত করেছে, পুষ্ট করেছে। একে প্রমাদবশত আমরা সমন্বয়ধর্মী মানসিকতা- ভাববাদী দর্শন প্রভৃতি নামে আখ্যা দেই যে তার কারণ উপনিবেশ আমাদের আত্মপরিচয়ের ঔজ্জ্বল্যকে ঘষাটে চোখে দেখবার শিক্ষাটাই শিখিয়েছে। কিন্তু তারপরও তাকালে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বমানবতা নজরুলের অপস্মার বিরোধী লড়াইয়ের ভেতর আরেক বিবর্তিত দর্শনের সাক্ষাৎ মেলে। সে দর্শন শুধু বাঙালির নয়- সর্বকালের সর্ব মানুষের।

স্বাধীন বাংলাদেশের কাছে যে প্রত্যাশা ছিল তা পূরণ হয়নি। মানুষের স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষার ভেতর ঢুকে পড়েছে আমাদের অলক্ষ্যে উপনিবেশের দূষিত আকাশ।

সে কেবলি নক্ষত্র ঢাকতে চায়- খোদার চাঁদ সূর্য ঢাকতে চায়- বাংলাদেশের অভ্রভেদী উত্থানের বিরুদ্ধে আমরাই যেন নিজেরা দাঁড়াতে চাইছি। যদি আমরা কর্মহীন ধর্মকে নিজেদের প্রধান অবলম্বন করতে অতিমাত্রায় উৎসাহী হই তবে স্বাধীন জাতির বিচিত্রতর বিকাশের পথ রুদ্ধ হবে। দেখত পাই ভবিতব্যহীন কবন্ধ রাজনীতির শরীরে দরিদ্রতম মানুষের রক্তাক্ত অভিশাপ লেগে আছে।

দরিদ্রের দর্শন নেই- ভিক্ষুকের সঙ্গীত কেবলি আর্তনাদ।

সহস্র বৎসরের বাঙালির ইতিহাস এই কথা বলে যে- এ দেশ সমগ্র বিশ্বমানবের স্থলে এসে দাঁড়াবে- ঘুরে দাঁড়াবে- আত্মঘাতী অন্ধ পথ চলার বিরুদ্ধে।